চিত্রাঙ্গদা চরিত্রঃ—

"মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সর্গে মাত্র একবারের জন্যই চিত্রাঙ্গদার এ কাব্যে আবির্ভাব কিন্তু সেই ক্ষণমাত্র আবির্ভাবেই সমগ্র মহাকাব্যের মূল সুরকে তিনি কারুণ্যের সুরে রূপান্তরিত করে দিতে সমর্থ হয়েছেন, বীরবাহু জননী চিত্রাঙ্গদাই এই কাব্যের প্রথম বলিষ্ঠ চরিত্র যিনি রাবণকে তাঁর পাপ সম্পর্কে সচেতন করে দেন।

চিত্রাঙ্গদা রাবণের মহিষী কিন্তু রাবণের প্রেয়সী নন, কৃত্তিবাসী রামায়ণে বীরবাহুর উল্লেখ থাকলেও রাবণ মহিষী চিত্রাঙ্গদার তেমন উল্লেখ নেই, চিত্রাঙ্গদার পরিচয় এখানে প্রাকৃত জননীর মতো। পুত্রের যুদ্ধযাত্রার খবর শুনে 'লঙ্কাকান্ডে' ছুটে এসেছেন তিনি, সাধারণ রমনীর মতো তাঁর আচরণ,—

" হেনকালে তার মাতা দূত মুখে শুনে।
দ্রুতগতি ধেয়ে আসে পুত্র দরশনে।।
কার বোলে যাহ পুত্র করিবারে রণ।
যত বড় বীর সব হইল নিধন।।"

মহাভারতে মণিপুর রাজদুহিতা কীর্তিমতি চিত্রাঙ্গদার কথা আছে সেই বীরত্বের ছাপ এখানে আভাসিত হতে পারে, এই চরিত্রটি মধুসূদনের স্ব-কল্পনায় সৃষ্টি, মাতৃত্বের মহিমায় পূর্ণ চিত্রাঙ্গদা চরিত্র - একদিকে যেমন স্নিগ্ধ, অন্যদিকে তেমনি তেজোপূর্ণ। চিত্রাঙ্গদার দেহ তাই আভরণহীন। পুত্র শোকের প্রবল আঘাতে শরীর হিম করা হিমের প্রকোপে শীতকালে পুষ্পহীন বনলতিকার মতো শীর্ণ হয়ে উঠেছেন তিনি, রাবণের ওপর পুত্রের ভার অর্পণ করে চিত্রাঙ্গদা ছিলেন নিশ্চিন্তে, কিন্তু পুত্রের মৃত্যুর দুঃসংবাদ শ্রবণে তাঁর সে নিশ্চিন্ততা ছুটে গিয়েছে। সম্রাট রাবণের

কাছে তাই তিনি অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। পুত্রশোকের নিদারুণ আঘাত চিত্রাঙ্গদার মর্মভূমিকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, ফলে লোকলজ্জাজনিত সংকোচ, রাজবধূর মেনে চলা নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে যেন শোকের ঝড় সঙ্গে করে প্রকাশ্য রাজসভায় এসে উপনীত হয়েছেন তিনি, কিছু পূর্বের জেগে ওঠা ভীতিপ্রদ অনুভূতিসমূহ রাজসভার সকলের মন থেকে মুহূর্তে মুছে যায়। সভাসদেরা চিত্রাঙ্গদার দুঃখের সমব্যথী হয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়ে,

মন্দোদরীর মতো চিত্রাঙ্গদা ক্ষমতাশালী নন, তাই যে পুত্রকে তিনি রাজার কাছে রেখে দিলেন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য—তার মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি অনুযোগ জানাতে ভুল করেননি, —

"দরিদ্র ধন রক্ষণ রাজধর্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?"

রাবন চিত্রাঙ্গদাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন নিজেকে পুত্রশোকে দোষী ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করে এবং চিত্রাঙ্গদাকে জানালেন তাঁর পুত্র দেশপ্রেমিক; দেশের শত্রুকে বিনাশ করতে গিয়ে সে জীবন দিয়েছে, অতএব রাবনের মতো 'বীরমাতা তুমি',

কিন্তু চিত্রাঙ্গদার শোক এতে সান্ত্বনা পায়নি, কেননা এ যুদ্ধ দেশরক্ষার যুদ্ধ নয় এ কেবল আপন যুদ্ধ। রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধের জন্য তিনি রাবনকেই দায়ী করেছেন, স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন লঙ্কার সিংহাসনের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে রামচন্দ্র লঙ্কাপুরী আক্রমণ করেননি, কারণ রাম মানুষ মাত্র, তাঁর ক্ষমতা অতি ক্ষীণ, তবে নতশির ফণী আঘাত পেয়ে আহত হলে যেমন ফণা গর্জন করে ওঠে দুর্বল রামচন্দ্র, আজ সেভাবেই শক্তিমান হয়ে উঠেছেন। অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বের পাপের পরাজয় হয়,

আর রাবন স্বয়ং-ই তো পাপী, চিত্রাঙ্গদা রাবণের পাপকে চিনিয়ে দিয়ে তাঁকেই এই বিপর্যয়ের জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করেন —

"হায় নাথ, নিজ কর্মফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে মজিলা আপনি;"

চিত্রাঙ্গদার দৃষ্টি মন্দোদরীর মতো প্রসারিত নয়, দেশের অন্যান্য মানুষের মৃত্যু তাঁর নিজ পুত্রশোকের সমতুল নয়, তাই তিনি কখনও লঙ্কাকে নিজের দেশ বলে উল্লেখ করে মন্দোদরীর মতো সবাইকে আপন করতে পারেননি, সংকীর্ণ পুত্রস্নেহের আবেগ চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের মাধ্যমে বড় মর্মস্পর্শী রূপে প্রকাশিত হয়েছে, তাই চিত্রাঙ্গদার একবারে ক্ষণিক আবির্ভাব আর তাঁর কথায় বার্তায় ও আচরণে রাবণের পাপ সম্পর্কে একদিকে পাঠক সচেতন হয়েছে, অন্যদিকে এই চরিত্র মধুসূদন অঙ্গীকৃত — 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত' — সফল হতে দেয় নি — কেননা করুণ রসে কাব্যটি পরিপূর্ণ হয়ে গিয়াছে,

রাবণ চরিত্র :

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রধান চরিত্র রাবণ না মেঘনাদ এ নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে, লঙ্কেশ্বর রাবণের চরিত্রে কবিআত্মার প্রতিফলন ঘটেছে এবং রাবণের পুত্র মেঘনাদ আসলে কবিরই মানসপুত্র — যাকে বধ করতে মধুসূদনের কলম অনেক কান্না কেঁদেছে, কিন্তু সমগ্র 'মেঘনাদবধ কাব্য' এ প্রসঙ্গে বিচার্য নয়, শুধুমাত্র প্রথম সর্গে মেঘনাদের পিতা লঙ্কেশ্বর রাবণের গুরুত্ব কতখানি তাই এখানে আলোচিতব্য বিষয়।

প্রথম সর্গে লঙ্কেশ্বর রাবণকে যেভাবে আঁকা হয়েছে তাতে তাঁর রাজকীয় আড়ম্বর তথা ঐশ্বর্য্য এবং শক্তিসামর্থ্য অতুলনীয়, তাঁর রাজসভা 'ভূতলে অতুল', স্ফটিকে গঠিত নানা বর্ণের মণিময় স্তম্ভের উপর রাজসভার স্বর্ণছাদ, সেই ছাদ থেকে ঝুলছে নানা রত্ন অলঙ্কারযুক্ত ঝালর, যেমনভাবে পুষ্পগৃহে দোলে পত্রপুষ্পে সমন্বিত লতা, লঙ্কেশ্বর বসে আছেন সেই সভাগৃহের মধ্যস্থলে সুমেরু পর্বতের মত উঁচু স্বর্ণ-সিংহাসনে, রাজার শুধু রাজকীয় ঐশ্বর্য্যই নেই রয়েছে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সুবিপুল সম্ভার, তাঁর ছত্র ধরে রয়েছে যে ছত্রধর তাঁর রূপের তুলনায় একমাত্র কামদেবকেই মনে পড়ে, যে চারজন কামিনীরা তাঁকে পাখা দিয়ে হাওয়া করছে তাঁদের রূপেরও তুলনা নেই, আবার এই

সুন্দর সুন্দরীর পাশে ভীষণেরও সমাবেশ ঘটেছে যখন দেখি রাবণ রাজার স্বর্ণ সভাগৃহের দ্বারে উপস্থিত রুদ্ররূপী দৌবারিক। রাবণের রাজসভার এই বর্ণনা প্রমাণ করে কবির রুচিবোধ এবং সূক্ষ্ম শিল্পবোধকে, মোহিতলাল মজুমদার এ কারণেই 'কবি শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থে জানিয়েছিলেন যে 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়তে হলে বাল্মীকির রামায়ণের কথা ভুলতে হবে।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর রাবণ গুণসম্পন্ন বীর, বীর, পুত্রবৎসল, পত্নীবৎসল, প্রজাবৎসল, সুশাসক। সুতরাং এককথায় একজন আদর্শ রাজার যে সব গুণ থাকা প্রয়োজন রাবণের চরিত্রে তার সবই রয়েছে, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সর্গেও রাবণের চরিত্রের এই সব বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু পরিচয় মেলে।

প্রথম সর্গের সূচনায় রাবণ তাঁর অপরূপ রাজসভায় বসে জানতে পারলেন তাঁর প্রিয় পুত্রের, বীরবাহুর নিধন সংবাদ। এই সংবাদ শোনার সাথে সাথেই তিনি বেদনায় ভেঙে পড়েন, যে রাবণের ভুজবলে স্বর্গের দেবতারা প্রকম্পিত— সেই রাবণের এই হাহুতাশ এবং ভেঙে-পড়া মূর্তি তাঁর পিতৃসত্তাকে স্পষ্ট করে চিনিয়ে দেয়, অবশ্য লঙ্কেশ্বর বীর, তাই মন্ত্রী সারণের সামান্য সান্ত্বনা বাক্য শুনেই নিজেকে সামলে নিয়েছেন এবং ভগ্নদূতের কাছে জানতে চেয়েছেন দুঃখজনক এই ঘটনার বিবরণ— বীরবাহুর যুদ্ধ এবং তার মৃত্যুর ঘটনা। রামচন্দ্রের সঙ্গে যেভাবে লড়াই করে বীরবাহু মারা গিয়াছেন তা শুনে রাবণ যথার্থ বীরের মত উল্লাস প্রকাশ করেছেন এবং তিনি প্রাসাদশির্ষ থেকে যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করতে,

প্রাসাদশির্ষ থেকে যুদ্ধক্ষেত্র দেখে এবং যুদ্ধক্ষেত্রের অদূরে সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধ দেখে অভিমানী মুক্তির পূজারী স্বাধীনচেতা রাবণ সমুদ্রকে তিরস্কার করেছেন এবং এই জাঙালকে অর্থাৎ বাঁধকে ভেঙে নিজেকে মুক্ত করার জন্য তাঁকে

অনুরোধ করেছেন, অতঃপর তিনি জানিয়ে দিয়েছেন পরদিন প্রাতে তিনি নিজে যুদ্ধে যাবেন আর এই যুদ্ধে,—

'অরাবণ অরাম বা হবে ভবে আজি',

রাবণ সভায় এসে বসার সাথে সাথেই বীরবাহুর জননী চিত্রাঙ্গদা সভাগৃহে প্রবেশ করে তাঁর কাছে জানতে চান যে তাঁর গচ্ছিত ধন রাবণ কোথায় কতখানি নিরাপদে রেখেছেন, রাবণ চিত্রাঙ্গদাকে জানান যে তিনি এক হতভাগ্য মানুষ — দৈব আর প্রতিকূল :— সুতরাং তাঁকে গঞ্জনা দেওয়া উচিত নয়, তাছাড়া তাঁর পুত্র দেশের সন্মানরক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে। বীরের মতো স্বর্গে গিয়াছে সে, রাবণের এই উক্তিতে বীরধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং একজন যথার্থ আদর্শ শাসকের কৌশলী মনোভাবের পরিচয় পরিস্ফুট, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা তাঁকে পরস্ত্রীহরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে যখন লঙ্কার দুর্ভাগ্যের দায়ভার তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়ে গেলেন তখন রাবণ অসহায়ভাবে শুধু বসে থেকেছেন, চিত্রাঙ্গদা চলে যাবার পর যুদ্ধে যাবার আয়োজন করতে শুরু করেছেন,

রাবণের চরিত্রকে এরপর আমরা প্রত্যক্ষভাবে আবার দেখি প্রথম সর্গের শেষ প্রান্তে যখন মেঘনাদ তাঁর কাছে এসেছেন সেনাপতি হবার বাসনা নিয়ে, অবশ্য মধ্যবর্তী অংশে রাবণের পরোক্ষ উপস্থিতি বার বার আমাদের চোখে পড়ে। যেমন সমুদ্রতলে জলের প্রবল কম্পনে ভীত হয়ে বারুণী মুরলার কাছে জানতে চেয়েছে এর কারণ কী? মুরলা জানিয়েছেন রাবণের সেনারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, সুতরাং যাঁর সৈন্যদের পদভরে সমগ্র লঙ্কা এমনকি সমুদ্রতল প্রকম্পিত তাঁর বীর্যের শৌর্যের তুলনা দেওয়া যায় না,

সভাগৃহে পিতার কাছে এসে মেঘনাদ সেনাপতি হবার বাসনা ব্যক্ত করেন। এ হেন পরিস্থিতিতে রাবণের দ্বিধাগ্রস্ত

মনোভাবের পরিচয় মেলে। এখানে তাঁর হৃদয়ে পিতৃসত্তা ও শাসকসত্তার দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রকট।

ইতোপূর্বে রাবণ চরিত্রের যেটুকু পরিচয় আমাদের গোচরে এসেছে তাতে রাবণের শাসক সত্তার রূপই স্পষ্ট, তবে বীরবাহুর মৃত্যুর খবর শুনে রাবণের বেদনাবোধ তাঁর পিতৃসত্তার পরিচয়কে তুলে ধরেছে। মেঘনাদ যখন রাবণের কাছে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন তখন আবার দেখা যায় রাবণ তাকে বাধা দিচ্ছেন — কেননা তিনি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছেন যে বিধাতা তাঁর প্রতি বিরূপ, তিনি তাঁর পক্ষে এ যুদ্ধ জয় অসম্ভব। তাঁর এই হতাশা যে কতখানি নির্মমভাবে সত্য সে কথা বোঝাতে তিনি যুক্তি দিয়ে বলেছেন, —

"তা না হলে মরিত কি কভু
শূলীসম্ভু সম ভাই কুম্ভকর্ণ মম
অকালে আমার দোষে, আর বীর যত
রাক্ষসকুলরক্ষণ,"

রাবণ রামচন্দ্রের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিত হয়ে পড়েছেন, কারণ ~~হাতে শিলা~~ যার হাতে শিলা জলে ভাসে, যে মরে গিয়ে আবার বেঁচে ওঠে — সে যে সাধারণ মানুষ নয়, মায়াবী নয়, - এ ব্যাপারে রাবণ নিশ্চিত, তিনি বলেছেন —

"কে কবে শুনেছে পুত্র ভাসে শিলা জলে
কে কবে শুনেছে লোক মরি পুনঃ বাঁচে,"

কিন্তু মেঘনাদ রাবণের এ সব কথায় কর্ণপাত করেননি, তিনি বীর, তিনি অগ্নি উপাসক, তিনি ইন্দ্রজয়ী, রামচন্দ্রকে যুদ্ধে তিনি দুবার নিহত করেছেন মেঘবাহের মতো তিনি সুযোগ চেয়েছেন এবং এবার রামচন্দ্রকে অগ্নিবানে ভস্ম করে বায়ুবানে সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেবেন — যাতে বাঁচার আর সুযোগ রামচন্দ্র না পান।

কিন্তু রাবণ জানেন মেঘনাদ তাঁর কণ্ঠের হার

প্রদীপ, তাই তিনি তাঁকে নির্বিঘ্নে যেতে দিতে পারেন না, তাঁর সাজানো বাগান তিলে তিলে শুকিয়ে গিয়েছে, এই পরিস্থিতিতে রাবণ মেঘনাদকে যুদ্ধে পাঠাতে দ্বিধাগ্রস্ত, এখানে রাবণের পিতৃহৃদয়ের পরিচয়ই সুস্পষ্ট, কিন্তু যখন দেশের কথা ভেবে মেঘনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে রাবণ তাঁকে সেনাপতি পদে বরণ করলেন, তখন রাবণের মধ্যে শাসক সত্ত্বার পরিচয়ই আবার প্রাধান্য পায়,

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সর্গে রাবণ চরিত্রে পিতৃসত্ত্বা ও শাসকসত্ত্বার সংঘাত ঘনায়িত হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাবণের শাসকসত্ত্বাই জয়যুক্ত হয়েছে, পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাতে দ্বিধাগ্রস্ত রাবণ প্রথমে সাধারণ মানুষের মতো অসহায়তা দেখিয়েছেন, কিন্তু শেষে তাকে একপাশে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে প্রত্যয়ীভঙ্গিতে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে দৃঢ় মতামত প্রকাশ করেছেন,